Machine Translated by Google

1969 সালে গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ সালের এই দিনে আইয়ুব খানের শাসনামলকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন জোরদার হয় যখন ঢাকার রাজপথে পুলিশের গুলিতে তরুণ স্কুল ছাত্র মতিউর রহমান ও এক রিকশাচালক নিহত হন। এটি শাসনের ক্রমবর্ধমান নার্ভাসনেসের আরও একটি লক্ষণ ছিল, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে, যেখানে দশ বছরের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটি জনপ্রিয় বিদ্রোহ দ্রুত আকার নিতে শুরু করেছিল। হাস্যকরভাবে, স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এবং তার সরকার সবেমাত্র একটি উদ্ভট পালনের মধ্য দিয়ে এসেছিল যাকে তারা অগ্রগতির দশক বলেছিল, যার উল্লেখ ছিল ক্ষমতায় আইয়ুবের দখলের দশ বছর।

1969 সালের জানুয়ারিতে, শাসনের জন্য সর্বনাশের লক্ষণ ছিল। সমস্ত পূর্বাভাস একটি বেসামরিক-সামরিক কমপ্লেক্সের আসন্ন পতনের দিকে ইঙ্গিত করে যা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ধরে রাখতে পারেনি। মতিউর হত্যার চার দিন আগে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তরুণ আসাদুজ্জামান। হতাশা কাজ করছিল, এই কারণে যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়েরই মানুষ অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করেছে, পরিবর্তন চাওয়ার প্রতিটি লক্ষণ প্রদর্শন করছে। ঢাকায়, এটি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য 34 জন বাঙালির বিচার শুরু হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের এগারো দফা প্রকাশ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শারবদলিও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য একত্রিত হয়েছিল। এবং, অবশ্যই, শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ফেব্রুয়ারী 1966 সালে প্রকাশ্যে ঘোষিত ছয় দফা নিযুক্ত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু তৈরি করেছিল। আর সেই ছবিতে এসেছিলেন অগ্নিগর্ভ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। 1960-এর দশকের গোড়ার দিকে মাওয়ের চীনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার কারণে দেশকে আইয়ুবকে বিরক্ত না করার পরামর্শ দেওয়ার পর, ভাসানী এখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জনগণের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর ছিলেন।

1969 সালের জানুয়ারিতে, পূর্ব পাকিস্তান ছিল একটি অপ্রতিরোধ্য বিদ্রোহের চিত্র। এক হাজার মাইল পশ্চিমে, পাকিস্তানের অন্য অংশ তার নিজস্ব, এবং অনুরূপ, প্রতিবাদের উপায় তৈরি করেছিল। পেশোয়ার, করাচি এবং লাহোরের ছাত্ররা এমনভাবে অভূতপূর্ব ছিল যেটা স্বাগত জানানো হয়েছিল, শহরের রাস্তা এবং বিস্তীর্ণ পথ দিয়ে তাদের জমায়েত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। খান আব্দুল ওয়ালী খান এবং জুলফিকার আলি ভুট্টো, যিনি আইয়ুব খানের শেষোক্ত একজন লোপপ্রাপ্ত অভিভাবক, কারাগারে ছিলেন, পরিবর্তনের দাবিতে শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ঢাকায় গণঅভ্যুত্থান যখন একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন পুরো দেশ পরিবর্তনের দাবিতে রাজপথে নেমেছিল।

এর আগে এয়ার মার্শাল আসগর খান ও বিচারপতি এস এম মুরশিদের জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের মাধ্যমে পরিবর্তনের দাবি আরও জোরালো হয়ে ওঠে। নবাবজাদা নাসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নুরুল আমিন এবং আবুল আ'লা মওদুদীর মতো রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি বরং বিস্ময়কর বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডিএসি) গঠনের মাধ্যমে দ্রুত গতিশীল সময়ের প্রয়োজনে উঠে আসে। আইয়ুব শাসন অভ্যুত্থানের পিছনের কারণগুলি বুঝতে অক্ষম ছিল --- এটি দেওয়ালে লেখা পড়া তার অক্ষমতার চিহ্ন ছিল --- এবং রাষ্ট্রপতি তার উপদেষ্টাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কেন লোকেরা 'এর জন্য কৃতজ্ঞ হচ্ছে না' তার শাসনের দশ বছরে অগ্রগতি হয়েছে। তিনি ইতিমধ্যেই 1970 সালে অফিসে নতুন মেয়াদের জন্য চাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এদিকে, কারাবন্দী ভুট্টোও জানিয়েছিলেন যে তিনি নির্বাচনে তার পূর্ববর্তী পরামর্শদাতাকে চ্যালেঞ্জ করবেন।

1969 সালের জানুয়ারিতে গণঅভ্যুত্থান দিবসটি ছিল ইতিহাসের একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত, বিশেষ করে সেই ভূখণ্ডে যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য ক্রমবর্ধমান দাবি তোলার ফলে, শাসন চাপ এড়াতে অক্ষম বোধ করে। পূর্ব পাকিস্তানে বেপরোয়া পুলিশি পদক্ষেপের আরও একটি উদাহরণে যখন একাডেমিক জোহাকে হত্যা করা হয় তখন এর বিচ্ছিন্নতা গভীর এবং গভীর হয়। ভাসানী প্রকাশ্যে জলেও-ঘেরাও (জ্বালাও এবং অবরোধ) নীতির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রতিবাদের একটি উচ্চকিত প্রতীক। আইয়ুব খান এবং তার মন্ত্রীরা বিরোধীদের কাছে পৌঁছাতে বাধ্য হন। ফেব্রুয়ারিতে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোলটেবিল সম্মেলনে DAC-কে তাদের প্রতিনিধিদের মনোনীত করতে বলা হয়েছিল।

Machine Translated by Google

সরকার মুজিবকে আরটিসিতে যোগদান করতে সক্ষম করার জন্য প্যারোলে মুক্ত করার প্রস্তাব দেয়, একটি প্রস্তাব কারাবন্দী আওয়ামী লীগ প্রধান অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরের রাস্তায়, ছাত্র এবং নাগরিকরা বর্ণালী জুড়ে তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মিছিল করেছিল, এই দাবিটি ক্রমবর্ধমান জ্বলন্ত ভাসানী দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ওয়ালি খান এবং ভুট্টো মুক্তি পেলে শাসনের আসন্ন আত্মসমর্পণের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়। ঢাকায়, সেনানিবাসে আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে সেনাবাহিনী যখন হত্যা করে তখন সরকার তার ক্ষুব্ধ সুনামের উপর একটি স্বতঃপ্রণোদিত আঘাত পায়। আগরতলা মামলার বিচারের প্রধান প্রধান বিচারপতি এস এ রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে পালাতে বাধ্য হয়ে জনপ্রিয় প্রতিরোধের শিখা আরও উপরে উঠেছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার সহ-অভিযুক্তদের 22 ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভাইস অ্যাডমিরাল এ আর খানের একটি ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তি দেওয়া হয়। মুজিবের রাজনৈতিক ঊর্ধ্বগতি সম্পূর্ণ হয়েছিল যখন পরের দিন, রেসকোর্সে লক্ষাধিক জনসমাবেশে, তাকে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধু--- বাংলার বন্ধু বলে সম্মানিত করা হয়। 24 ফেব্রুয়ারী 1969 তারিখে, তিনি আরটিসি-তে স্থান নিতে রাওয়ালপিন্ডিতে যান। চাকলালা বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা তার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার মন্তব্য জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু ছয় শব্দের জবাব দিয়েছিলেন: "গতকাল একজন বিশ্বাসঘাতক, আজ একজন বীর।" তাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ছিলেন আসগর খান।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর গোলটেবিল সম্মেলনটি মার্চের শুরুতে স্থগিত করা হয়েছিল, যখন বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে সংসদ নির্বাচন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োজন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য ভবিষ্যত তার ছয় দফার আরও সারগর্ভ আকারে আসবে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচি। ইতিমধ্যে, ভুট্টো এবং ভাসানী, আরটিসি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে, কী করা দরকার তা তাদের চুক্তিতে সিলমোহর দিয়েছিলেন। আইয়ুব খান সংসদীয় গণতন্ত্র এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারে সম্মত হওয়ার পরেও RTC ভেঙে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করতে তার বিরোধী সহকর্মীদের অনিচ্ছায় ক্ষুব্ধ হয়ে আওয়ামী লীগকে DAC থেকে বের করে নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। DAC, এর অংশ হিসাবে বাঙালি নেতা ছাড়াই দ্রুত ভেঙে পড়ে।

মজার ব্যাপার হল, আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী সরকারের সেই মৃত্যুদিনে পাকিস্তানে কতটা পরিবর্তন এসেছিল তা বঙ্গবন্ধুকে একটি ব্যক্তিগত নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রীর পদের প্রস্তাব দিয়েই বোঝা যায়। অনুমান করা যায়, বঙ্গবন্ধু অফারটি হাত থেকে নাকচ করে দেন। এদিকে, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই আইয়ুবকে চারণভূমিতে পাঠাতে এবং ক্ষমতা দখলের জন্য কূটকৌশল চালাচ্ছিল। দুর্বল আইয়ুবের কাছে এটা ঘটেনি যে 1962 সালে তার শাসনামলের সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু বা অক্ষমতা বা পদত্যাগের ক্ষেত্রে ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের স্পিকারের হাতে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত, 25 মার্চ 1969 সালে, মোহাম্মদ আইয়ুব খান স্পিকার আবদুল জব্বার খানের কাছে নয় বরং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতায় থাকা নতুন জেনারেল অবিলম্বে দেশে সামরিক আইন জারি করেন।

গণঅভ্যুত্থানের প্রভাব ও ফলাফল 1969
এই গণ-অভ্যুত্থানের পথ ধরে বাঙালি জাতি এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা অর্জন করে।

সামরিক আইন পুনঃ জারি করা হয়, তবে সম্মত হয় যে শীঘ্রই এর ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে
সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, এবং সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করা হবে।
পুলিশ এবং বেসামরিক ও সামরিক আমলাদের ভয় অনেকাংশে কমে গেছে।
শ্রেণী চেতনা বেড়েছে এবং এক ধাপ এগিয়েছে।
পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে আলাদা রাষ্ট্রের দাবি আগের চেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে

শাহেদ আসাদের সম্মানার্থে স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি কয়েকটি স্থানের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে, সেগুলো হলো;

• আইয়ুব নগর থেকে শের-ই-বাংলা নগর

Machine Translated by Google

• আইয়ুব গেট থেকে আসাদ গেট
• আইয়ুব শিশু পার্ক থেকে মতিউর শিশু পার্ক ইত্যাদি।
এছাড়াও, সার্জেন্ট জহুরুল হকের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক হলের নামকরণ করে তাকে সম্মানিত করা হয়।

1969 সালের গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য
১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তারা ছিল:

1. আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের উপসংহার
2. আগরতলা মামলার বিমূর্ততা
3. সংসদীয় গণতন্ত্র এবং ভোটের স্বীকৃতি
4. বাংলা ভাষার ক্রমবর্ধমান মর্যাদা
5. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
6. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ
7. স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা

বাকিটা ইতিহাস. 1969 সালের গণঅভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানে দাবির জন্য বন্যার দ্বার উন্মুক্ত করবে --- এবং এটা কোন ব্যাপার না যে পাকিস্তান আবার তার সামরিক বাহিনীর হাতে ছিল ---
গণতন্ত্রের জন্য সঠিক এবং নিরবচ্ছিন্ন। পাকিস্তান যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল তা দ্রুত আকার ও রূপ নিচ্ছে। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর ষষ্ঠ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু জানিয়ে দেন যে, এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান হবে বাংলাদেশ।

1970 সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তুঙ্গে।
জাতীয় পরিষদের সদস্য, বঙ্গবন্ধু তার ঘোষণায় জোর দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের সংবিধান হবে তার ছয় দফার উপর ভিত্তি করে। এমনকি তার দল সংসদের ফ্লোরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত হলেও, রাওয়ালপিন্ডিতে ষড়যন্ত্র আরও একবার ভয়ঙ্কর আকার নিতে শুরু করেছিল। জেড এ ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ৮৮টি আসন নিয়ে, ১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতে ঢাকায় নির্ধারিত অ্যাসেম্বলি অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করে।

1971 সালের 15 থেকে 24 মার্চের মধ্যে, ঢাকায় ইয়াহিয়া খান জান্তা, আওয়ামী লীগ এবং পিপিপির সাথে জড়িত রাজনৈতিক আলোচনা নিষ্ক্রিয় প্রমাণিত হয়েছিল কারণ রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত রাজনৈতিক-সামরিক জোট ইতিমধ্যেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 25 মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে জঙ্গী বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন।

ফলাফল পাকিস্তানের জন্য একটি বিপর্যয় ছিল। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের ছাইয়ের উপর উঠেছিল; এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, 1971 সালের 25 মার্চ থেকে পাকিস্তানের কারাগারে, 1972 সালের জানুয়ারিতে বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে আসেন।
এটি ছিল বাঙালির আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ এবং বাঙালির উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের এক মহাকাব্যিক কাহিনী। 1969 সালের জানুয়ারিতে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এটির সূচনা হয়। তাই আমি এটি বিবেচনা করি
'১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের অভিব্যক্তি।'